সাঁওতাল বিদ্রোহ ১৮৫৫

জাকির তালুকদার

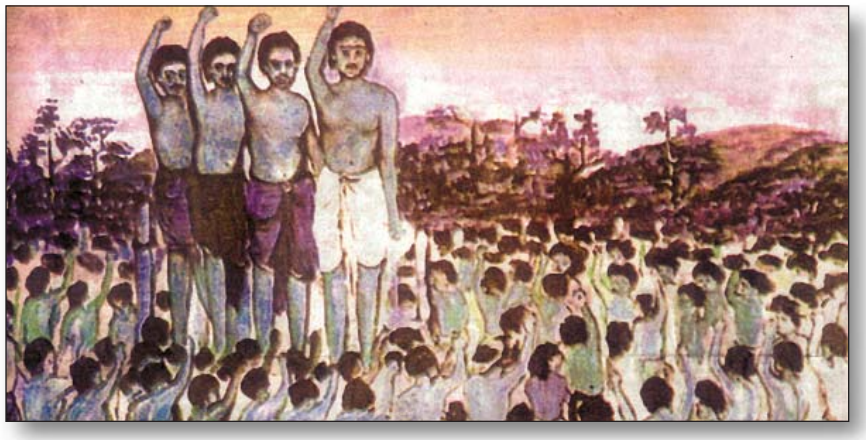

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে আরম্ভ হলো 'হুল'। সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেদিন ১৬ আষাঢ় ১২৬২ সন। ইংরেজি তারিখে ৩০ জুন ১৮৫৫। হুল শুরু হলো দিকু (হিন্দু) মহাজনদের বিরুদ্ধে। যারা কেড়ে নেয় সাঁওয়ালদের ক্ষেতের ফসল। কেড়ে নেয় কাড়া (মহিষ), ছাগল, মুরগি। সুদের চক্রে বেঁধে সাঁওতালদের বাধ্য করে ক্রীতাদাসত্বে আবদ্ধ হতে। হুল শুরু হলো সেই ভূতদের বিরুদ্ধে যে ভূতেরা তাদের জীবন লণ্ডভণ্ড করেছে, তাদের কুঁড়েঘর ভিটেমাটি থেকে উপড়ে ফেলছে। আর তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের দেশকে কেড়ে নিয়ে তাদের নিজভূমে পরবাসী করে রেখেছে।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। অঝোর বর্ষণে দামিন-ই-কো-র রুক্ষ মাটি গলে গলে পড়ছে। সেই মাটিতে পড়ে আছে কুখ্যাত মহেশ দারোগার মুণ্ডুহীন ধড়। বৃষ্টির সঙ্গে মিশে দারোগার রক্ত বয়ে যাচ্ছে শালবনের দিকে। শুরু হয়েছে হুল। সাঁওতালদের রুখে দাঁড়ানোর লড়াই।

চম্পা দেশ থেকে দামিন-ই-কো

নিষাদ জাতির অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালদের আদি বাসভূমি যে ভারতবর্ষ, তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না নৃতাত্ত্বিকরা। ধারণা করা হয়, আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের অনেক আগে থেকেই সাঁওতালরা এই ভূমির বাসিন্দা। অনেকের মতে, তারাই নাকি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রাম নামক স্থায়ী বসতি স্থাপন এবং কৃষির উদ্ভাবন করে। তারা বাংলা-বিহার অঞ্চলে প্রবেশ করে অনেক পরে। রাজমহল থেকে ছোটনাগপুর, সেখান থেকে ঝালদা ও পাতকুম এবং পরে পঞ্চকোট অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। এখান থেকে তারা যায় সাওন্ত নামক স্থানে। প্রবাদ আছে যে, সাওন্ত থেকেই তাদের জাতির সাঁওতাল নামের উৎপত্তি। ইতোপূর্বে তাদের পরিচয় ছিল 'হড়'। সাঁওতালি ভাষায় হড় শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষ। এদের একটি অংশ দক্ষিণ মানভূম ও দামোদর তীরের হাজারীবাগ জেলায় বসবাস করতে শুরু করে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে, সাঁওতালরা বাংলা-বিহার সীমান্তে আসতে শুরু করে ১৭৯০ সাল থেকে। এসব অঞ্চলে জমিদাররা জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে শ্রমিক হিসেবে বিপুলসংখ্যক সাঁওতালকে নিয়োজিত করে। সাঁওতালরা প্রথমে আসে বীরভূম জেলায়, তারপর ক্রমে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পাকুর, দুমকা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল বসতি স্থাপন করেছিল ভাগলপুরের দামিন-ই-কো-তে। যার বর্তমান নাম সাঁওতাল পরগনা।

খুব দ্রুতগতিতে ঘটল দামিন-ই-কো-র বিস্তার। সাঁওতাল নারী-পুরুষ একত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্বাপদ-সংকুল বন-জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করল, বাড়িঘর তৈরি করল। ফলে দামিন পাহাড়ের কোলে একটা জনমানবহীন পাণ্ডববর্জিত নির্জন অরণ্য প্রান্তরে গড়ে উঠল জনপদ, গ্রাম। গ্রামের দুই পাশে সারি সারি মাটির বাড়ি, খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়াল। রাঙা মাটির রঙে রাঙানো দেয়ালে লতাপাতা এবং পদ্মফুলের ছবি আঁকা। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের লেখা থেকে জানা যায়, ১৮৩১ সালে যেখানে দামিন-ই-কো-তে মোট মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার, গ্রাম ছিল ৪২৭টি, সেখানে ১৮৫১ সালের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৪৭৩টিতে, অধিবাসী সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৮২ হাজার ৭৯৫ জন। এসব গ্রামের বাইরে পাহাড় ও জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বাস করত কমপক্ষে আরো ১০ হাজার সাঁওতাল। আর প্রচন্ড পরিশ্রম করে, হাতি-ভালুক-জন্তু-জানোয়ারদের হাত থেকে ক্ষেত রক্ষা করে যে ফসল তারা ফলাত, তাতে নিজেদের সাংবৎসরিক চাহিদা তো মিটতই, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত শস্য গরু-মহিষের গাড়িতে করে চালান যেত ভরতবর্ষের দূরতম প্রদেশগুলোতে। কখনো কখনো সমুদ্রপথে ইংল্যান্ডেও। অর্থাৎ সাঁওতালদের পরিশ্রমের ফলে অরণ্যবেষ্টিত দামিন-ই-কো পরিণত হয়েছিল স্বর্ণপ্রসবা রাজ্যে। ৮৬০ বর্গমাইল উচ্চভূমি এবং ৫০০ বর্গমাইল বিশিষ্ট নিম্নভূমির সমন্বয়ে গঠিত দামিন-ই-কো-র সাঁওতাল আতুগুলোতে (গ্রাম) সুখের জীবন বয়ে চলত।

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো সাঁওতালদের জীবনযাত্রা। প্রত্যেক গ্রামে নির্বাচিত হতো একজন সর্দার, যাকে বলা হতো মাঝি। গ্রামের মানুষের সব কর্মকাণ্ডে মাঝিই ছিল সর্বমান্য বিচারক। আর ছিল একজন পরামানিক, একজন গোরাইত, একজন যোগমাঝি এবং একজন দেশমাঝি। তবে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিল পরগনাইত, যাকে অনেকটা সামন্ত রাজার মতো মান্য করা হতো।

নিজেদের সমাজ ও বিচার-ব্যবস্থা, ফসল ফলানো, শাল-মহুয়ার জঙ্গলে শিকার, অবসরে নাচ-গান, হাঁড়িয়া পান- এই নিয়ে ছিল সাঁওতালদের সুখের জীবন।

ভগবান মহান কিন্তু তিনি থাকেন অনেক দূরে

দামিন-ই-কোর এই সমৃদ্ধির খবর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। বড়াহাইত বাজার এবং মিরানপুর ছিল সাঁওতালদের পণ্য বিপণনের দুটি প্রধান কেন্দ্র। অচিরেই দেখা গেল এ দুই বাজারে ঘাঁটি গেঁড়েছে বাঙালি, পাঞ্জাবি এবং গুজরাটি মহাজনেরা। এরা সাঁওতালদের কাছ থেকে ক্রয় করত ধান, চাল, সরষে, তিল, বোরো, তিসি। বিনিময়ে সাঁওতালদের দেয়া হতো ন্যায্যমূল্যের চেয়ে অনেক কম পরিমাণ টাকা অথবা টাকার পরিবর্তে তামাক, লবণ, কাপড়-চোপড়ের মতো নিত্যব্যবহার্য পণ্য। পরিমাণের এই বৈষম্যের প্রতিবাদ জানালে মহাজনেরা বলত যে লবণ হচ্ছে আবগারি পণ্য। এর জন্য প্রচুর শুল্ক দিতে হয়। এছাড়া মহাজনেরা পণ্য কেনাবেচার জন্য দুই রকমের বাটখারা ব্যবহার করত। একটা বাটখারা কেবল পণ্য ক্রয়ের জন্য। স্বাভাবিকের তুলনায় এর ওজন বেশি। একে বলা হতো কেনারাম বা বড় বৌ। অন্য বাটখারা ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজনের। এটাকে বলা হতো বেচারাম বা ছোট বৌ। সাঁওতালরা আধুনিক বৈশ্য সমাজের এতো জটিলতা কখনোই পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পারেনি বটে, কিন্তু কোথাও যে একটা অসামঞ্জস্যতা রয়ে গেছে তা ঠিকই আন্দাজ

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতীক সিধু

করতে পারতো। কিন্তু তারা ছিল নিরুপায়।

সঞ্চয় কাকে বলে সাঁওতালরা তা জানত না। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কোনো মাথাব্যথা তাদের ছিল না। তাদের কাছে বর্তমানই সব। তারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই ফুর্তিবাজ। যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রয়োজন বা সামর্থ্যের চাইতে বেশি খরচ করে ফেলার প্রবণতা ছিল তাদের। তখনই হাত পাততে হতো মহাজনের কাছে। আর মহাজনেরা তো ঋণ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। মহাজন যত টাকা ধার দিত, লিখিয়ে নিত তার কয়েকগুণ বেশি। দশ টাকা ধার দিয়ে মহাজন সুদসমেত ১৫-২০ টাকা লিখিয়ে নিত এবং টাকা শোধের সময় ঐ সুদসমেত টাকা আসল বা মূল হিসাবে ধরে আবার তার সুদ আদায় করতো। বছরের শেষে চাষিদের গোলায় ধান উঠে যাবার পর মহাজন গরুর গাড়িতে অথবা ঘোড়ায় চেপে লোকলস্করসহ পাওনা আদায়ে বের হতো। তারা গিয়ে উঠত খাতকের ঘরে। মহাজন ও তার সহিসদের থাকা, খাওয়ার খরচ এবং পথখরচা বহন করতে হতো খাতক সাঁওতালকেই। ফসল ওজন করার পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। গ্রামে ঢোকার সময় মহাজনরা কুড়িয়ে নিত বড়সড় একটা পাথর। সিঁদুর মাখিয়ে এই পাথরকেই দেখানো হতো ওজনের একক হিসেবে। ফলে পাথুরে জমিতে অশেষ পরিশ্রম করে যে ফসল ফলিয়েছিল সাঁওতাল, যে ফসল সে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছিল বন্য হাতি, শূকর, হরিণ, বন্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে অপরিসীম মমতায়- সেই ফসল তাকে পুরোটাই তুলে দিতে হতো মহাজনের হাতে। তবুও শেষ হতো না তার ঋণ। কোনো সাঁওতাল চাষি মহাজনের হাতে ফসল তুলে দিতে অস্বীকার করলে মহাজনরা ঘুষ দিয়ে দেওঘর বা ভাগলপুরের আদালত থেকে নিয়ে আসত ক্রোকি পরোয়ানা। আদালতের পেয়াদার উপস্থিতিতে তখন নিজের সর্বনাশ চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না সাঁওতাল চাষিদের। সব দিয়ে দেবার পরেও যখন ঋণ শোধ হতো না, তখন সে বাধ্য হতো নিজেকে বন্ধক দিতে এবং মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হতে। বিনা পারিশ্রমিকে সে বাধ্য হতো মহাজনের বাড়ি ও জমিতে শ্রম দিতে। একে বলা হতো বেঠবেগারি। খাটতে খাটতে তার জীবন শেষ হয়ে যেত। তার পরবর্তী বংশধরের কাছে সে উত্তরাধিকার হিসেবে একটি জিনিসই শুধু রেখে যেতে পারতো। তা হলো দেনা, মহাজনের ঋণ। সেই ঋণ তার জীবদ্দশায় হয়তো সামান্য কিছু বাকি ছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার বেড়ে যেত কয়েক গুণ। তার বংশধর, যে তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মহাজনের ক্রীতদাসত্ব লাভ করেছে সেও খাটতে খাটতে জীবন শেষ করে দিত, কিন্তু দেনা শোধ হতো না।

এর সঙ্গে যোগ হলো ইংরেজদের খাজনা এবং জমিদারের অত্যাচার। জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করার সময় ইংরেজ কোম্পানি সরকার সাঁওতালদের তিন বছর জমি ভোগ করার অধিকার দিয়েছিল বিনা খাজনায়। তিন বছর পরে জমির মূল্যায়নের ভিত্তিতে নামমাত্র খাজনা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন গোটা গ্রামের মিলিতভাবে বছরে ৩ টাকা থেকে সর্বাধিক ১০ টাকা খাজনা ধার্য হয়। এ ব্যবস্থার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে সাঁওতাল পরগনাইতদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতি বিঘায় ২ আনা, কিন্তু সর্বাধিক ৮ আনা বাৎসরিক খাজনা নির্ধারিত হয়। বাস্তবে আদায় করা হচ্ছিল অনেক বেশি টাকা। এমনকি বছরে বছরে তা বৃদ্ধি হচ্ছিল অবিশ্বাস্য হারে। ১৮৩৮ সালে যেখানে মোট খাজনা ছিল মাত্র ২০০০ টাকা, সেখানে ১৮৫১ সালে আদায় করা হয় ৪৩,৯১৮ টাকা ১৩ আনা।

এর সঙ্গে সঙ্গে যোগ হয়েছিল স্থানীয় জমিদারদের লোলুপ দৃষ্টি। সাঁওতালরা তিলে তিলে যে জমি গড়ে তুলেছে, সেই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদের অন্যতম পথ ছিল খাজনা বাকি ফেলা। তারা এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে পথ অবলম্বন করতো, তা সব অমানবিকতাকে হার মানায়। তারা তাদের গরু, ছাগল, মহিষ, টাট্টু ঘোড়া, এমনকি হাতির বাঁধন খুলে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হতভাগ্য দরিদ্র সাঁওতালদের ক্ষেতের পাকা ফসল নষ্ট করে ফেলত। এই তথ্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন ঐতিহাসিক কে কে দত্ত তাঁর 'দি সান্তাল ইনসারেকশন' গ্রন্থে।

অক্টোপাসের নাগপাশে আবদ্ধ সাঁওতাল তখন প্রতিকার খোঁজে। ইংরেজের বিচারালয় তার কাছ থেকে অনেক দূরে। কে কে দত্তের জবানীতেই বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থেই লিখেছেন- 'সাঁওতালদের ভাগলপুর আদালতে যেতে হতো। ভাগলপুর তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে। পায়ে হেঁটে, বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কোনোরকমে ভাগলপুর পৌঁছুলেও ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ কোর্টের আমলা, মোক্তার, পিয়ন এবং বরকন্দাজ সবাই দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আবার মাঝে মাঝে যদিও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের দেখা মিলত কিন্তু ভয়ে সে সেখান থেকে দূরেই থাকতো। তার বাড়ির কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্ত দারোগা বা থানা-পুলিশের ন্যায়বিচারের যে রূপ সে দেখতে পায়, তা মৃত্যুরই নামান্তর।'

অসহায় সাঁওতাল তাই আকাশের দিকে মুখ তুলে ভগবানের কাছে প্রতিকার চায়। কিন্তু কোনো স্বর্গীয় প্রতিকার আসে না। সাঁওতাল তখন হতাশ হয়ে বলে- ভগবান মহান, কিন্তু থাকেন অনেক দূরে।

দেখা দিলেন ভগবান সিধু-কানুর মাঝে

১৮৫৪ সালের শেষে আর ১৮৫৫ সালের শুরুতে শীতকালে হঠাৎ দেখা গেল দামিন-ই-কো-র সাঁওতালরা অস্থির হয়ে উঠেছে। সে বছর ফসল খুব ভালো হয়েছিল, তাদের শস্যের দামও বাজারে বেশ চড়া ছিল। তবুও তারা হয়ে উঠেছিল অস্থির। এই অস্থিরতার কারণ তাদের একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। অবস্থাপন্ন সাঁওতালরা ঠিক করেছিল তারা দিকু (হিন্দু) মহাজনদের তাদের দেশে এসে লাভের বখরা আর নিতে দেবে না। গরিব দিনমজুর সাঁওতালরা পর্যন্ত ক্রীতদাসত্ব করতে নারাজ হবে বলে ঠিক করলো।

এই রকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, বিশেষ করে মানুষ যখন এই রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তখন নেতার অভাব হয় না। সেই সময় তাদের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভাব সিধু-কানুর। ভগনাডিহি গ্রামের এই দুই ভাই নিষ্কলুষ চরিত্রের কারণে সুখ্যাত ছিল। তারা বলল যে পর পর সাতদিন ভগবান তাদের দেখা দিয়েছেন। প্রথম দিন দেশী পোশাকে এক সাহেবের চেহারায়, পরের দিন ভগবান দেখা দিয়েছেন অগ্নিশিখার মধ্যে জ্বলন্ত ছুরিকা হয়ে। তারপর ভগবান দেখা দিলেন একটি শালগাছের গুঁড়ির আকারে, যা দিয়ে সাঁওতালদের গরুর গাড়ির চাকা বানানো হয়।

তারা আরো দাবি করলো যে, স্বর্গ থেকে তাদের কাছে একটি পবিত্র গ্রন্থ পাঠানো হয়েছে এবং কাগজের টুকরার বৃষ্টি হয়েছে সাঁওতাল এলাকাজুড়ে। প্রত্যেক গ্রামেই কাগজের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল। সঙ্গে নির্দেশ ছিল, যদি ভগবানের অভিশাপ না চাও, তাহলে বার্তাটি পৌঁছে দাও পাশের গ্রামে। এভাবে একজোট হয়ে পড়ল সমগ্র দামিন-ই-কো।

একের পর এক গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল সাঁওতালদের মধ্যে। পরবর্তীতে জানা গেছে সবগুলো গুজবই ছিল গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। এই গুজবগুলো বিদ্রোহ বা হুলের জন্য সাঁওতাল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত করেছিল।

প্রথম গুজবটা হলো লাগলাগিন (নাগনাগিন) সাপেরা আসছে, লোকেদের গিলে খাবে। সেই বিধিলিপি খণ্ডাবার জন্য পাঁচ গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে অন্য পাঁচটি গ্রামে ঘুরবে। সবাই তাই করল। হুলের জন্য এক ডাকে দশ গ্রামের লোকদের জড়ো করার পদ্ধতি পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় গুজবটা হলো এই যে, সমান সমান ছেলে হয়েছে যে মেয়েদের তারা দুইজন করে সই পাতাবে। কাপড় দেয়া-নেয়া হবে, খাওয়া-দাওয়া করবে। কেন এই গুজব? সকলে

আত্মীয়তা বন্ধুত্ব করে যেন একমন, একপ্রাণ থাকে, বিদ্রোহকালে যেন কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতা না করে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায় সেটাই কারণ।

তৃতীয় গুজব একটি মহিষ আসছে। যার আঙিনায় ঘাস পাবে সেখানেই সে শুয়ে পড়বে এবং তার বংশের লোক মরে শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠবে না। সেই ভয়ে সবাই নিজের আঙিনা পরিষ্কার করলো। হুলের সভা-সমাবেশ-বৈঠক-বিচার-জল্পনা-কল্পনার জন্য পরিষ্কার আঙিনার প্রয়োজন, তাই এই গুজব।

চতুর্থ গুজব ডোমদের নিয়ে। গুজব রটল যে, গঙ্গা নদীতে সোনার নৌকায় ডোমরা চামড়া বেঁধেছিল বলে নৌকা ডুবে গেছে এবং সে জন্য ডোমদের কেটে ফেলা হচ্ছে। ডোমরা সেই ভয়ে বন্য জানোয়ারের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সাঁওতালী বেশ ধরে সাঁওতালদের ঘরে থাকছে। কেন এই গুজব! সাঁওতালদের সঙ্গে যাতে ডোমরাও যোগ দেয়, তাই।

পঞ্চম গুজব হলো যে, লায়োগড়ে (লোহাগড়) কুমারী মেয়ের গর্ভে সুবা জন্মেছে, সকলে সেখানে যেন শিকারের জন্য যায়। লোকেরা গেল, সুবাকেও দেখল আর তার সঙ্গে কাঞ্চন বনেও শিকার করলো। শিকার করা জানোয়ার এক জায়গায় জমা করে কাটল আর লোকেরা ভাগ নেবার জন্য একটি করে পাতা নিয়ে এলো। সেই পাতা গুণে দেখা হলো কত হাজার লোক জমা হয়েছে। তখন তাদের বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে বলা হলো।

পরের গুজবটি একেবারে অন্যরকম। দিকুদের মারবার জন্য কারা যেন আসছে। হড়হপনরা (সাঁওতালরা) যেন গ্রামের মাথায় গরুর চামড়া আর একজোড়া বাঁশি টাঙিয়ে রাখে, যাতে সকলে বুঝতে পারে যে সেটা সাঁওতালদের গ্রাম। বিদ্রোহের সময় যাতে সাঁওতালদের কোনো গ্রাম স্বজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

এভাবে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। ইতিমধ্যে সিধু-কানু আশা করেছিলেন যে, ইংরেজ লাটসাহেবরা যখন এসব জানাতে পারবে, তখন নিশ্চয়ই কিছুটা খোঁজখবর নেবে এবং তাদের দুর্দশা লাঘবে এগিয়ে আসবে। তারা সরাসরি দরখাস্ত পাঠাল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে এবং আশু প্রতিকার প্রার্থনা করে। সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিল যে, তাদের ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, বেশি অপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর এলো না ইংরেজদের কাছ থেকে।

তখন সিধু-কানু ঠিক করলেন যে, সাঁওতালরা কোলকাতা যাবে। তারা সরাসরি বড়লাটের কাছে গিয়ে নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসবে। ৩০ জুন ১৮৫৫ সালে বিশাল সমাবেশের পরে সম্মিলিত সাঁওতাল জনতা রওনা দিল কোলকাতার উদ্দেশ্যে। হান্টার লিখেছেন যে, এই অভিযানে নেতাদের দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ৩০,০০০ জন। তবে অভিযানে কেবল সাঁওতালরাই ছিল না, ছিল অন্য সম্প্রদায়েরও নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতি মানুষ। ছিল হিন্দুদের নিম্নবর্গীয় কুমার, তেলি, কামার, কর্মকার ছাড়াও মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়, যাদের মোমিন বলা হতো।

অভিযাত্রীর দল কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করার আগে পাঁচখেতিয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে পূজা দেয়া।

ইতিমধ্যে মহাজনরা সাঁওতালদের সমবেত হবার খবর পেয়ে গেছে। তাদের পাঁচখেতিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা শুনে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা ছুটে গেল দীঘি থানার কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্তের কাছে। ১০০ টাকা ঘুষ দিয়ে তারা দারোগাকে জানাল যে কোনো মূল্যে সিধু-কানুকে গ্রেপ্তার করতে হবে। মহেশ দারোগা তার দলবল নিয়ে সিধু-কানুকে বন্দি করার জন্য অগ্রসর হলো।

bIMvq mvIZvj we‡`ªvni cZxK gwZ wma-Kvb

পথিমধ্যে দেখা হওয়ায় সিধুর একজন অনুচর তাদের সিধু-কানুর কাছে নিয়ে গেল। সিধু-কানু দারোগাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? দারোগা মিথ্যা কথা বলে। বলে যে, সে একটি সাপে কাটা মৃত্যুর তদন্ত করতে এখানে এসেছে। এ কথায় দারোগাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু কারো কারো মনে সন্দেহ উদয় হলো। তারা জেরা শুরু করলো দারোগাকে। জেরার মুখে দারোগা স্বীকার করল যে, সে সিধু-কানুকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। কানু বললেন যে, দারোগা যদি প্রমাণ করতে পারে তারা চুরি-ডাকাতি করেছেন, তাহলে তাদের গ্রেপ্তার করুক। মাথামোটা দারোগা মনে করল সিধু-কানু আত্মসমর্পণ করছেন। তার সঙ্গী মহাজনেরা বলল যে, তারা প্রয়োজন হলে দারোগাকে ১০০০ টাকা দিতে রাজি আছে। দারোগা সিধু-কানুকে গ্রেপ্তার করুক। দারোগা দলবল নিয়ে সিধুকে বাঁধবার জন্য অগ্রসর হলো। তখন কানু তলোয়ার বের করলেন। সিধুর বাঁধন কেটে দিয়ে এক কোপে কেটে ফেললেন মহাজন মানিক মুদির মাথা। আর সিধু হত্যা করলেন দারোগা মহেশলাল দত্তকে। অন্য সাঁওতালদের হাতে নিহত হলো দারোগার সঙ্গী পাঁচজন।

হাজার হাজার সাঁওতাল আকাশপানে হাতিয়ার উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল- হুল! হুল!

তখন আর কোলকাতা যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সিধু-কানু সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন ভগনাডিহিতে। শুরু হলো সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রাম।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহ। দলে দলে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হলো। গোচো মাঝি কয়েক হাজার লোক নিয়ে খাঁপুর এবং বাহাদুরপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। সিধু-কানু তাদের অপর দুই ভাই চাঁদ ও ভৈরবসহ বিশাল বাহিনী নিয়ে সুলতানাবাদ দখলের জন্য মহেশপুরের দিকে অগ্রসর হন।

জমিদার, মহাজন এবং ইংরেজ রাজ কর্মচারীরা পালিয়ে যায়। কেউ কেউ নিহত হয়। বিদ্রোহীরা অল্প সময়ের মধ্যে বোরিও থেকে কোহলগাঁও পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা নিজেদের দখলে এনে ভাগলপুর ও রাজমহলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমে এ দু'শহরের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা তাদের দখলে আসে। ডাক ও রেল বন্ধ হয়ে যায়। পিরপাঁইতি থেকে সকরিগলি পর্যন্ত সড়কও তাদের দখলে চলে আসে। উত্তরে গঙ্গা নদী, পূর্বে গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে অজয় ও বরাকর নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা যেমন বীরভূম জেলা, ভাগলপুর জেলা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রমে আরো বেশি বেশি সাঁওতাল কৃষক চাষের কাজ ফেলে রেখে বিদ্রোহে যোগ দিতে থাকে। কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকলেও গড়ে ওঠে সত্যিকারের একটি বিশাল গণবাহিনী। সাধারণত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু যুদ্ধের নাকাড়া বাজার সঙ্গে সঙ্গে কমপক্ষে দশ হাজার সাঁওতাল একঘন্টার মধ্যে জমায়েত হতে পারতো। তাদের অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক, টাঙি, কুঠার ও তলোয়ার। সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়াও চলছিল গেরিলা যুদ্ধ।

শেষ কথা

অসম যুদ্ধের ফলাফল যা হয়, তাই ঘটেছে সাঁওতাল বিদ্রোহের বেলাতেও। ইংরেজরা দামিন-ই-কোতে সামরিক আইন জারি করল। একজন মেজর জেনারেলের নেতৃত্বে সুসজ্জিত বাহিনী নিয়োগ করা হলো বিদ্রোহ দমনে। নিহত হলো হাজার সাঁওতাল। নিহত হলেন সিধু। ফাঁসি দেয়া হলো কানুকে। রক্তের নদীতে ডুবে গেল দামিন-ই-কো।

তাহলে কি এই বিদ্রোহ পুরোপুরি ব্যর্থ? ইতিহাস সে কথা বলে না। সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহীদের সংগ্রাম সরাসরি বিজয়ী না হলেও এই সংগ্রাম ভারতবর্ষের কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আরো উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করেছে। এই বিদ্রোহীদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী প্রেরণা যুগিয়েছে পরবর্তীতে অগণন কৃষক বিদ্রোহে। তাই হুলের কোনো শেষ নাই, সিধু-কানুর মরণ নাই।